গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১৪ মার্চ ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

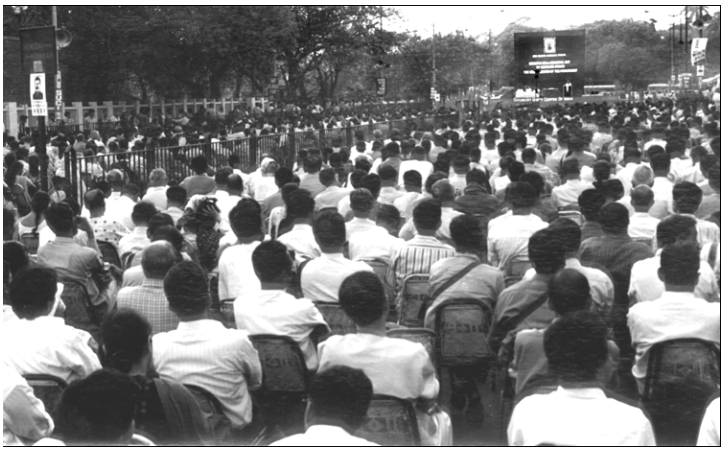

৫ মার্চ ২০০৩, কমরেড স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতায় বিশাল সভা ও (ডানদিকে) কমরেড স্ট্যালিনের প্রতিকৃতি নিয়ে পাটনায় মিছিল (সংবাদ আটের পাতায়)

দল বিপ্লব সমাজতন্ত্র এবং স্ট্যালিন এক ও অভিন্ন

৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

৫ মার্চ ২০০৩, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড জোসেফ স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী। এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আহবানে ওই দিন রাজ্যে রাজ্যে জনসভা সহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ওইদিন কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সনৎ দত্ত।

রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে রক্তপতাকায় শোভিত বিশাল মঞ্চের পশ্চাৎপটে ছিল কমরেড স্ট্যালিনের ফটোগ্রাফ। বিশাল জনসমাবেশের উত্তর দিকে ছিল বুক স্টল ও প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে ছিল জীবন, সংগ্রাম, দল ও সংগঠন সম্পর্কে কমরেড স্ট্যালিনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি এবং কমরেড স্ট্যালিনের শৈশব থেকে শেষযাত্রা পর্যন্ত কঠোর সংগ্রামী মহিমময় জীবনের নানা সময়ের ফটোগ্রাফ। এদেশের কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলির স্ট্যালিনবিরোধিতা, নীরবতা অথবা স্ট্যালিনের মূল্যায়নের নামে সংশোধনবাদীদের অপপ্রচার ও কুৎসারই ভিন্নভাষায় জাবর কাটার বিপরীতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই-এর মূল্যায়ন সংশোধনবাদীদের মুখোস খুলে দিতে সাহায্য করেছে। কমরেড ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে জনসভায় মহান স্ট্যালিনের জীবন ও সংগ্রামের কিছু দিক তুলে ধরেন সভার প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — বর্তমান বছরটি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহবানে এই মুহূর্তে রাজ্যে রাজ্যে জনসভা সহ নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ৫০ বছর আগে এই ৫ মার্চ কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে, কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই নয়, গোটা দুনিয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সমগ্র ইউরোপ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নেমেছিল। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষ গভীর শোকে অভিভূত হয়েছিল। এই কলকাতা শহরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে বিশাল শোকমিছিল হয়েছিল তার দ্বিতীয় নজির নেই। বিংশ শতাব্দীতে, লেনিনের মৃত্যুর পর, তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক এবং সুমহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্ট্যালিন কোটি কোটি মানুষের অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে ভয়ের চোখে দেখত। শোষকশ্রেণীর চোখের ঘুম তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন, তাই স্ট্যালিন সম্পর্কে তাদের ছিল তীব্র বিদ্বেষ। হিটলারি ফ্যাসিস্টরা, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরের শত্রু সংশোধনবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে সীমাহীন মিথ্যা, কুৎসা রটিয়েছে, তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা করেছে ; সেদিনও করেছে, আজও সে চেষ্টা করে চলেছে। কারণ স্ট্যালিন সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের পথপ্রদর্শক। এই নামটির সাথে শোষণমুক্তির সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষা করার সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের জীবন ও সংগ্রামের বহু দিক পর্যালোচনা করে কমরেড প্রভাস ঘোষ দেখান — ব্যক্তিগত জীবন বলতে তাঁর কিছু ছিল না। দল, বিপ্লব, সমাজতন্ত্র এবং কমরেড স্ট্যালিন ছিলেন এক ও অভিন্ন। অত্যন্ত কঠিন সংগ্রামের দিনে তিনি কীভাবে লেনিনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিহাস থেকে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন — আর এস ডি এল পি-র গোড়ার দিকে প্লেখানভ ও লেনিনের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামে স্ট্যালিন লেনিনকে সমর্থন করেছিলেন। বিপ্লবের আগে বহু বছর লেনিনকে বিদেশে থাকতে হয়েছিল, সে সময়ে দল ও আন্দোলনকে গড়ে তুলতে লেনিনের নির্দেশগুলি রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন স্ট্যালিন। অত্যন্ত কঠোর বিপদসঙ্কুল জীবনে ১২ বছর তিনি আত্মগোপন

পাঁচের পাতায় দেখুন

বি পি এল তালিকায় নির্লজ্জ কারচুপি

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের চিহ্নিত করে তাঁদের মধ্যে বি পি এল কার্ড বিলি করার কাজ এখন রাজ্য জুড়ে চলছে। বলা হয়েছে — এই কার্ড যাঁদের থাকবে তাঁরা মাঝে মাঝে কিছু সরকারি সাহায্য পাবেন। সমস্যাজর্জরিত রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাই স্বাভাবিকভাবেই এই কার্ড পেতে আগ্রহী। কিন্তু তাঁরা সবিস্ময়ে দেখছেন, গ্রামের অধিকাংশ গরিব মানুষের নামই বি পি এল তালিকায় স্থান পায়নি। তাঁরা আরও দেখছেন, গ্রামের দোতলা বাড়ির মালিক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, পঞ্চায়েত প্রধান, এমনকি সি পি এম-এর এম এল এ মকর টুডুর নামও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। ফলে গ্রাম বাংলায় সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড অসন্তোষ। গ্রামের মানুষ বিক্ষোভে গজরাচ্ছেন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন অফিস ঘেরাও করছেন — এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করে সি পি এম নেতা-মন্ত্রীদের বক্তব্যের মূল সুর। কিন্তু 'সুবোধ বালকের মত' কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নির্বাচনে তার প্রভাব পড়তে পারে। ফলে বহু জায়গায় বি পি এল তালিকা তৈরির পরও তাঁরা কার্ড বিলি বন্ধ রেখেছেন, আবার সাথে সাথে প্রচার করছেন — এই সবের জন্য তাঁরা একেবারেই দায়ী নন। 'কেন্দ্রের সরকার যেভাবে করতে বলেছে আমরা সেভাবেই বি পি এল তালিকা তৈরি করছি' — এই হল সি পি এম নেতা-মন্ত্রীদের বক্তব্যের মূল সুর। কিন্তু 'সুবোধ বালকের মত' কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মাথা পেতে মেনে

দুয়ের পাতায় দেখুন

বি পি এল ঃ কেন্দ্র নির্দেশিত পথেই চলেছে সি পি এম

একের পাতার পর

নিয়েই বা তাঁরা তালিকা তৈরিতে হাত দিলেন কেন — এই প্রশ্নে কিন্তু সি পি এম নেতারা নিরুত্তর। কখনও কখনও আমতা আমতা করে বলছেন — 'এছাড়া কোন উপায় ছিল না।' সে যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশি গরিব মানুষের নাম বি পি এল তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কারা দায়ী, তালিকায় বেনোজল ঢুকলো কী করে এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য খতিয়ে দেখা দরকার এই তালিকা তৈরির প্রক্রিয়াটা কি।

নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণের আগে দেশনেতারা ভারতকে একটা জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলে দাবি করতেন। তখন তাঁরা মাঝে মাঝে দারিদ্র্য দূরীকরণের কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বহু প্রচারিত 'গরিবি হঠাও' স্লোগানের কথা নিশ্চয়ই অনেকের খেয়ালে আছে। কিন্তু তথাকথিত এই দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচিতে দারিদ্র্য বেড়ে গেলেও একে কেন্দ্র করে একটা বিতর্কের জন্ম হয়। তা হল গরিব কারা, দারিদ্র্যের মাপকাঠিই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তখন দেশের বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন — একজন সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন দৈনিক ৩৩০০ ক্যালরি শক্তি যোগায় এমন খাবার। এর সাথে অন্যান্য জিনিস যেমন বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্বালানি ইত্যাদি দরকার। জীবনের এই সামান্য প্রয়োজনও যাঁরা জোগাড় করতে পারেন না — তাঁরাই গরিব, তাঁদেরকেই দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তখনকার পরিকল্পনা কমিশন বিশেষজ্ঞদের এই প্রস্তাবে কান দেয়নি। তাঁরা বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্বালানি ইত্যাদিকে বাদ দিলেন এবং বললেন, সুস্থভাবে বাঁচার জন্য ৩৩০০ ক্যালরি খাবারের দরকার নেই, ২৪০০ ক্যালরি খাবার হলেই বেশ চলে যাবে। এইভাবে ১৯৭৩ সালে শুধুমাত্র ২৪০০ ক্যালরি খাবারের মানদণ্ডে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যরেখার মাপকাঠি বেঁধে দিয়েছিলেন এবং তখনই তাঁরা বলেছিলেন মাসিক ৪৩.০৯ টাকা খরচ করলেই নাকি এই পরিমাণ খাবার যোগাড় করা যাবে। দেখা যাচ্ছে — তখন থেকেই গরিবের সত্যকার মাপকাঠি নির্ধারণ শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্য ছিলনা, গরিবি হটানোর কথা বলে তাঁরা দেশে সত্যকার গরিবের হার কম করে দেখাতেই চেয়েছিলেন।

নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণের পর দেশের শাসকশ্রেণীর এই প্রয়োজন আরও অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। কারণ মানুষ প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছে, এই নয়া আর্থিক নীতির ফলে দেশের সাত লক্ষ কারখানা হয় বন্ধ না হয় বন্ধ হওয়ার মুখে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়ার সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে — তাদের হাত থেকে জমি আরও দ্রুত হারে চলে যাচ্ছে। ক্ষেতমজুরের কাজ নেই, নেই বাঁচার মত মজুরি পাবার কোন ব্যবস্থা, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পণ্যে পরিণত, বাড়ছে পরিবহনের ভাড়া, বেকারের সংখ্যা কল্পনাকেও হার মানিয়েছে, অনাহারে মৃত্যু, অভাবে আত্মহত্যার খবর আসছে প্রতিদিন দেশের নানা প্রান্ত থেকে — এইসব মিলিয়ে মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমা হচ্ছে, তাঁরা ক্রমশই প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন। চূড়ান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়োজনে দেশের ও বিদেশের শাসক-শোষকেরা একটা কথা তারস্বরে প্রচার করছে। তা হল, নয়া এই আর্থিক নীতি ও বিশ্বায়নের ফলেই নাকি ভারতবর্ষে গরিবের হার কমে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। একথা তৃণমূল সমর্থিত কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বলছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যাঙ্ক এবং সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারও একথা বলছে। সবারই একই দাবি — তাঁদের সুশাসনেই নাকি এমন অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু জনগণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাঁরা নিজেরা একথা ভাল করেই জানেন, ঘটনা ঘটছে ঠিক উল্টো। — দারিদ্র্য আগের সব রেকর্ড অতিক্রম করে গিয়েছে। এ কারণে, বাস্তবকে সুবিধামত পরিবেশন করতে গিয়ে তাঁরা পরিসংখ্যানের এক ধরনের কারচুপির আশ্রয় নিয়েছেন এবং দারিদ্র্যের এমন একটা মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন যা এককথায় হাস্যকর।

আমরা আগেই বলেছি, কীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে গরিবির মাপকাঠি নীচু স্তরে বেঁধে গরিবের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী প্রদর্শিত সেই পথই বর্তমানের কেন্দ্রের সরকার গ্রহণ করেছে। তবে ১৯৭৩ সালের দৈনিক মাথাপিছু ২৪০০ ক্যালরি খাদ্যগ্রহণের যে মাপকাঠি ধরা হয়েছিল বর্তমান সরকার এমনকি সেই মাপকাঠিও মানতে চাইছে না। এই সরকার বলছে —দেশের উন্নয়নের ফলে জীবনধারণের জন্য এখন দেশের সাধারণ মানুষকে আর আগের মত কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না, এবং একারণেই আগে কমপক্ষে যতটা খাবার দরকার হোত এখন আর ততটা প্রয়োজন নেই। তাই ১৯৭৩ সালে দৈনিক মাথাপিছু ২৪০০ ক্যালরি খাদ্যের (বিশেষজ্ঞরা তখন ৩৩০০ ক্যালরি খাবারের কথা বলেছিলেন) মাপকাঠি ঠিক করলেও সরকারি মতে এখন একজন মানুষের ১৮০০ - ১৯০০ ক্যালরি দৈনিক খাবার জোগাড় করতে পারলেই চলে যাবে। এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার পরিকল্পনা কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা পরিসংখ্যানের নানাবিধ কারচুপির আশ্রয় নিয়ে ঠিক করেছেন — গ্রামে মাথাপিছু মাসিক ২৭৪ টাকা ৩৫ পয়সা বা দৈনিক ৯ টাকা ১৫ পয়সা খরচ করতে পারলেই একজন মানুষকে আর গরিব বলে ধরা হবে না। ফলে সরকারি সাহায্যের খুদকুঁড়ো তার জুটবেনা। অথচ, বর্তমান বাজারদরে এই ৯ টাকা ১৫ পয়সায় একজন মানুষের দৈনিক নানাবিধ প্রয়োজন মিটিয়ে আধপেটা খাবার জোগাড়ও অসম্ভব। তাই সরকারের এই মাপকাঠি ধরলে একজন অনাহারী মানুষ এমনকি একজন ভিখারিকেও গরিব বলা চলে না। অথচ এই মাপকাঠি বেঁধে দিয়ে তাঁরা বলছেন — দেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের হার এখন ৩৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে মাত্র ১৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাঙ্ক দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছে — 'ভারতে এই হারে দারিদ্র্য কমতে থাকলে দুই হাজার কুড়ি সালে আর গরিব মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।' বিশ্বব্যাঙ্কের এই সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়েই তাঁরা বোঝাতে চাইছে কত দ্রুত দেশ এগোচ্ছে। রাজ্যে বি পি এল তালিকা তৈরির সময় কেন্দ্রের তৃণমূল সমর্থিত বিজেপি সরকার বলে দিয়েছে দেখতে হবে যাতে এই তালিকায় কোন মতেই ৩৬ শতাংশের উপর মানুষের নাম স্থান না পায়। অর্থাৎ গরিব কত আছে তা দেখার বদলে আগেই তারা ঠিক করে নিয়েছে গরিব কত দেখানো হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল রাজ্যের সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার সুবোধ বালকের মত এই মাপকাঠি মেনে নিল কেন? কেন তারা প্রশ্ন তুললো না — দারিদ্র্যের মাপকাঠি নির্ধারণে শুধু পরিবারের খাদ্যের প্রয়োজনের কথা মাথায় রাখলেই চলবে না, (যদিও বিজেপি সরকার এই প্রয়োজনও অস্বীকার করেছে), বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্বালানি ইত্যাদি প্রয়োজনের কথাও ভাবতে হবে। কিন্তু সি পি এম ফ্রন্ট সরকার সে প্রশ্ন তোলেনি। কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের বেঁধে দেওয়া এই মাপকাঠি তারাও মেনে নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যকে ব্যবহার করে তারা আগেই ঘোষণা করেছিল — এ রাজ্যে গরিবের হার মাত্র ২৬ শতাংশ। অর্থাৎ তারা আরও আগে বেড়ে দেখাতে চাইছে এ রাজ্যে গরিবের সংখ্যা সর্বভারতীয় হারের চেয়েও কম। গরিবির মাপকাঠির প্রশ্নে দুই সরকারই একমত, দুই সরকারই এই মাপকাঠি অনুযায়ী গরিবের হার কমে যাওয়ার দাবি করছে; ফলে গরিবের হার কম করে দেখানোর জন্য, অর্ধেকের বেশি গরিব মানুষের নাম বি পি এল তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য তৃণমূল সমর্থিত বিজেপি সরকারের নীতি দায়ী একথা যেমন ঠিক, তেমনি রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও কি তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? আসলে জনবিরোধী এই দুই সরকারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষ যেমন জীবনের সবক্ষেত্রেই বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, তেমনি সরকারি খুঁদকুঁড়ো সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও সবচেয়ে গরিব মানুষই যে বঞ্চিত হবে — এতে আর বিচিত্র কি!

কংগ্রেস, বিজেপি বা তৃণমূলের ভূমিকা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এসব দলগুলি শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর রক্ষক। ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর সি পি এম নেতৃত্বের ভূমিকা বুঝতেও আজ আর আমাদের রাজ্যবাসীর কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমরা দেখেছি, এই সরকার শুধু আর পাঁচটা বুর্জোয়া দল পরিচালিত সরকারের মতই আচরণ করছে না — কোন কোন ক্ষেত্রে বুর্জোয়া দল পরিচালিত অন্য রাজ্যের সরকারের থেকেও পুঁজিপতিদের সেবায় অনেক গুণ এগিয়ে গিয়েছে। বাস্তবে পুঁজিপতিদের গোলামির ক্ষেত্রে সি পি এম নেতৃত্ব আজ অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই গরিব মানুষের মর্মযন্ত্রণা তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনা। দুটো ডাল-ভাত জোগাড়ের জন্য গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ কীভাবে মাঝরাতে উঠে শাকের আঁটি মাথায় নিয়ে কলকাতার দিকে ছোটে, অনাহারী মানুষগুলো কেমন করে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে — তা তাঁরা দেখতে পাননা। কারণ তাঁরা বামপন্থা পরিত্যাগ করেছেন। আমরা জানি, বামপন্থা হল গরিব মানুষের ব্যথাবেদনার সংগ্রামী প্রকাশ, বামপন্থা হল মেহনতি মানুষের রক্ত-ঘাম-পরিশ্রমে গড়ে তোলা গণসংগ্রাম। সংগ্রামের এই ঝাণ্ডাকেই সর্বহারা- শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে লাগাতার গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে, বল্গাহীন এই আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। গ্রামে গ্রামে আমাদের এই আওয়াজ তুলতে হবে — যারা দুবেলা পেটভরা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্বালানির ন্যূনতম আয়োজন করতে পারেনা — তাদেরই গরিব বলে ঘোষণা করে বি পি এল তালিকাভুক্ত করতে হবে, সেইমতো বাস্তব দারিদ্র্যরেখা নির্ধারণ করতে হবে। বি পি এল তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোন পূর্ব নির্ধারিত হার বেঁধে দেওয়া চলবে না। এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে সমস্ত দলবাজি বন্ধ করতে হবে। বি পি এল তালিকাভুক্ত সমস্ত মানুষের খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

নদীয়ায় আইন অমান্য

২৭ ফেব্রুয়ারি নদীয়ার তেহট্ট মহকুমার বিভিন্ন ব্লক থেকে সহস্রাধিক কৃষক ও ক্ষেতমজুর ছোট বড় মিছিল করে হাজির হয় মহকুমা সদরের জিৎপুর মোড়ে। দাবি ছিল — গরিব মানুষের দৈনিক কাজ ও ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার, হাসপাতালে বর্ধিত চার্জ ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুলবৃদ্ধি প্রত্যাহারের। আরও ছিল বামফ্রন্টের গরিব মারা খাজনা নীতি বাতিল, বি পি এল তালিকায় দুর্নীতি বন্ধের দাবি ইত্যাদি। এইখানে এক স্বল্প সময়ের সভায় বক্তব্য রাখেন কে কে এম এস জেলা সম্পাদক কমরেড জাকিমউদ্দীন সেখ এবং কে কে এম এস জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ ধনপতি মণ্ডল, আস্তাব আলী, বাসুদেব হালদার। এরপর দাবি সম্বলিত ফেস্টুন, ব্যানারে সুসজ্জিত মিছিল তেহট্ট টাউনের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিল তেহট্ট মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছানোর আগেই বিশাল এক পুলিশ বাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। কমরেড জাকিমউদ্দীন সেখের নেতৃত্বে শিশু কোলে মহিলা সহ সকলেই পুলিশ কর্ডন ভেঙে আইন অমান্য করেন।

নির্জোট আন্দোলন থেকে ফায়দা তুলতে চায় ভারতীয় পুঁজিবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘ সময় ধরে 'ন্যাম' অর্থাৎ নির্জোট আন্দোলন বিশ্বরাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। একদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক এই দুই শিবিরের উপস্থিতিতে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত ছোট-বড় সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল নির্জোট আন্দোলন। নির্জোট দেশগুলি তাদের নিজস্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য — এই নির্জোট আন্দোলনকে দর কষাকষির এক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করত। ক্ষেত্রবিশেষে সাময়িকভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় দাঁড়াত তারা। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরও এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, নির্জোট দেশগুলিকে সমর্থন করার মধ্য দিয়ে — তাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলতে বা তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারত।

আশির দশকের শেষদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবলুপ্তির পর থেকে এই নির্জোট আন্দোলন বস্তুত প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত শেষ নির্জোট সম্মেলনের দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর সম্প্রতি ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে যে ত্রয়োদশতম নির্জোট সম্মেলন তথা শীর্ষ বৈঠক হয়ে গেল — তাকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যমের একাংশও প্রশ্ন তুলেছে — সমাজতান্ত্রিক শিবির নিশ্চিহ্ন, ফলে এখন তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্ব' বা 'নির্জোট'-ও অর্থহীন। তাদের অনেকের বক্তব্য, যে নির্জোট আন্দোলন বস্তুত মৃত, যার কোন প্রাসঙ্গিকতা আজ আর নেই — তাকে নিয়ে হৈ-চৈ করার, তাকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য চেষ্টা করার কোন অর্থ নেই। তা অনাবশ্যক, অবান্তর, অযথা কালক্ষেপ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, যে আন্দোলন প্রায় মরতে বসেছিল, আজ আবার হঠাৎ করে তার ধূয়া তোলা হচ্ছে কেন? নববই-এর দশকে, যখন সাম্রাজ্যবাদীদের তোলা স্লোগান — 'বিশ্ব এখন একমেরু', 'সমাজতন্ত্রের দিন শেষ', এখন শুধু 'উদারীকরণ আর বিশ্বায়নের যুগ' ইত্যাদির মোহে প্রায় গোটা পৃথিবী উদ্বাহু হয়ে উঠেছিল, তখন এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরাই বুঝিয়েছিল যে নির্জোট আন্দোলনের আর 'রাজনীতির আখড়া' হয়ে পড়ে থাকার দরকার নেই, তার দিন শেষ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার গরম গরম রাজনীতির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই তখন থেকেই নির্জোট আন্দোলন ক্রমশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল — উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে, তাদের সঙ্গে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির আলাপ আলোচনা চালানোর এক ধোপদুরস্ত সংস্থা।

আবার নির্জোট আন্দোলনের নিজস্ব বহু সমস্যাও আছে। যেমন এতে এবার যোগ দিয়েছিল ১১৬টি দেশ। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য — সব প্রশ্নেই এদের মধ্যে অগাধ পার্থক্য। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের মত এদের মধ্যে অনেকে একে অপরের বৈরীভাবাপন্ন। ফলে যে কোন প্রশ্নে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখানে দুরূহ ব্যাপার। অথচ নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম রীতি হল, যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক তাতে সবার সম্মতি থাকা চাই।

চরিত্রে, রীতিনীতিতে জটিল এই নির্জোট আন্দোলনের এবারের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? আগেই বলেছি এবার ১১৬টি দেশ এতে যোগ দিয়েছিল। এমন কি আমেরিকা পর্যন্ত তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল পর্যবেক্ষক করে, নির্জোট দেশগুলো শেষপর্যন্ত কি করে বসে, তার ওপর নজর রাখার জন্য। যোগদানকারী দেশের মধ্যে টিমর ও সেন্ট ভিনসেন্ট নির্জোট আন্দোলনের নতুন সদস্য। তাছাড়া, আগে যা কখন হয়নি, এবারের এই নির্জোট শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ৬৩ জন রাষ্ট্রপ্রধান মালয়েশিয়ার রাজধানীতে পা রেখেছিলেন; অতীতে ৩০-৩৫-এর বেশি হত না এই সংখ্যা।

কিন্তু শুধু সংখ্যা বাড়াই নয়, আন্দোলনে যোগদানকারী দেশগুলির অধিকাংশের এবারের 'মুড' ছিল অনেকটা ভিন্ন। সাম্প্রতিক বিশ্বরাজনীতিতে এক অন্যতম ঘটনা ইরাকের বিরুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারের রণহুঙ্কার। লক্ষণীয়, সম্মেলনে গৃহীত আটটি সর্বসম্মত ঘোষণার ছয়টি প্রত্যক্ষভাবে ইরাক সংক্রান্ত। যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উগ্র যুদ্ধবাদী প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার প্রশাসনের প্রেরিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গৃহীত এই সমস্ত প্রস্তাবের মূল সুরটিই ছিল কিন্তু যুদ্ধবিরোধী। প্রস্তাবিত সামরিক পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে, রাষ্ট্রসংঘের সহায়তায় ইরাক সমস্যার সমাধানের জন্য দাবি করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের কোন অনুমতি ছাড়া ইরাকের আকাশে 'নো ফ্লাই জোন' জারী করার নিন্দা ও ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ তুলে নেওয়ার দাবির পাশাপাশি নিঃশর্তভাবে অস্ত্রপরীক্ষকদের কাজ করতে দেওয়ার জন্য ইরাকি সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এককেন্দ্রিক প্রভুত্বের নাম না করেও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাষ্ট্রসংঘকে শক্তিশালী করে তুলে, বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

একথা ঠিকই যে প্রস্তাবের বয়ান ও ভাষা অনেক জায়গায়ই প্রথম যা ছিল, তার থেকে অনেক নরম করে দেওয়া হয়েছিল। কোথাও 'আগ্রাসন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। যদিও যা বলতে চাওয়া হয়েছে, তা মার্কিন আগ্রাসনকেই ইঙ্গিত করে। বেশিরভাগ দেশই তাদের নিজেদের অর্থনীতি-রাজনীতির দিকে তাকিয়ে খুব বেশি করে মার্কিন বিরোধিতার দিকে যেতে চায়নি। তবু মার্কিন পর্যবেক্ষকের ঔৎসুক্য আর ভ্রূকুটির সামনে গৃহীত এই প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব কিছু কম নয়। এতদিন ইরাক প্রসঙ্গে বিশ্বের মানুষ ইঙ্গ-মার্কিন জোট ও ইরাকের বক্তব্য শুনছিল। আর শুনছিল এর পাশাপাশি ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও চীনের মার্কিন মতামতের বিরোধিতা; বড়জোর ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে এই যুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে মতামতের কথা। নির্জোট সম্মেলন প্রথম সুস্পষ্ট করে তুলে ধরল — বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ উন্নয়নকামী দেশের শাসকদের ইঙ্গ-মার্কিন জোটের যুদ্ধ হুঙ্কারের বিরোধী বক্তব্য। দেখা গেল, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের এইসব দেশগুলির সকলেই মনে করছে, যা ঘটছে ও ঘটতে যাচ্ছে — তা ঠাণ্ডা যুদ্ধের আমলের থেকেও ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। সেই সঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদের কথায় বেরিয়ে এসেছে আর একটা সত্য। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিকে 'মিসম্যানেজড' অর্থাৎ ছন্নছাড়া বলে আখ্যা দিয়ে তিনি সম্মেলনকে সতর্ক করে বলেছেন যে বিশ্বের গরিব দেশের জনগণের উপর ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলি যেভাবে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে, তাতে তাদের মধ্যে ক্রোধই বাড়ছে। আমরা যদি এখনই কিছু না করি, তাহলে এই জনগণ কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধেও উঠে দাঁড়াবে।

অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন জোটের যুদ্ধপ্রস্তুতির বিরুদ্ধে পৃথিবীর দিকে দিকে শান্তিকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের যে যুদ্ধবিরোধী, এমনকি পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে — তার ধাক্কা নির্জোট দেশগুলিতেও পড়ছে। সেসব দেশের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীও ভয় পাচ্ছে — এই সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও ছেড়ে দেবে না। কারণ তারা খুব ভাল করেই জানে আজকের কি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের এই নির্জোট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আজ চূড়ান্ত সংকটে। যত ঢাকঢোল পিটিয়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা 'একমেরু' বিশ্বে অবাধ বিশ্বায়নের কথা প্রচার করে থাকুক না কেন, তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা আর বাজারসঙ্কটের ধাক্কায় সেই অবাধ প্রগতির ফানুস চুপসে গিয়েছে। পরিবর্তে সংকট কাটাতে বাজারদখলের প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন তীব্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ইরাক সঙ্কটকে ঘিরে এই দ্বন্দ্ব আজ বিশ্বের সামনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মার্কিন-ব্রিটিশ জোটের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় দাঁড়িয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি আর তার সাথে রাশিয়া ও চীন। যে ন্যাটোকে কেন্দ্র করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে সোভিয়েট তথা সমাজতন্ত্র বিরোধিতার সমস্ত প্রচেষ্টা গড়ে তুলেছিল, সেই ন্যাটোতেও আজ মার্কিন বিরোধিতা তীব্র রূপ নিয়েছে।

সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের নিজের নিজের দিকে টেনে আনার। তাই দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স আফ্রিকার বত্রিশটি দেশকে নিয়ে সম্মেলন করছে। মার্কিন প্রতিনিধি আজ আরব দুনিয়া কাল দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে; রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পুতিন চীন ঘুরে এসে নামছেন ভারতে। আবার আরব লীগভুক্ত দেশগুলি বসছে নিজেদের মধ্যে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির, বিশেষ করে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বাড়ছে দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বই আজ নির্জোট আন্দোলনের দেশগুলির সামনে নতুন করে এক সুযোগ এনে দিয়েছে — নরম সুরে হলেও যুদ্ধবিরোধিতার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার।

একথা ঠিক যে আজকের নির্জোট আন্দোলনের এই প্রেক্ষিত কিন্তু অতীতের নির্জোট আন্দোলনের প্রেক্ষিত থেকে ভিন্ন। অতীতে সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকায় নির্জোট দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার, তাদের সাথে দরকষাকষি করার যে বাড়তি সুযোগ পেত, আজ সেটা নেই। আজ এই দেশগুলো নিজেদের পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে মূল সখ্যতা, দহরম মহরম বজায় রেখে চলে। তাই তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার গণ্ডিও খুবই সীমিত। কিন্তু এইক্ষেত্রে আবার কাজ করছে আজকের বিশ্বপরিস্থিতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কট আজ তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা, দেউলিয়া, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতি, ন্যক্কারজনক সাংস্কৃতিক নৈতিক অবক্ষয়ের রূপে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশকে গ্রাস করেছে। বিশ্বায়ন-উদারীকরণের 'খুড়োর কল' সামনে ঝুলিয়ে রেখে, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কিছু দেশকে ঘিরে যে উন্নয়নের 'মিথ' গড়ে উঠেছিল, তা আজ সঙ্কটের ধাক্কায় বুদ্বুদের মত ফেটে গেছে। আর এর সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে ও বাড়ছে ছোটবড় সব দেশে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের রক্ষক সরকারের সাথে শোষিত জনগণের দ্বন্দ্ব। তাই দুনিয়াব্যাপী বাজার দখলের উদগ্র লালসায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক ছোটখাট দেশগুলির বিরুদ্ধে যে নৃশংস আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে শক্তিসঞ্চয় করছে, তেমনই সেই শান্তি আন্দোলন ক্রমশ বিশ্বায়নবিরোধী, এমনকি পুঁজিবাদবিরোধী প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেরাই বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় যুদ্ধ বাধায়, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। আজও ইরাক, আফগানিস্তান, যুগোশ্লাভিয়ার মত

ছয়ের পাতায় দেখুন

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে মন্দার ধাক্কা ভারতে

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে মন্দার কারণে জার্মান সরকারের এক সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলিরও শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। জার্মান সরকার বলেছে, ২০০৩ সালের ৩১ জুলাই থেকে তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের জন্য তারা আর কোন 'গ্রীন কার্ড ইস্যু করবে না। ফলে যে সমস্ত ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানি জার্মানির বাজারে কাজ করে তারা বিপদে পড়বে। জার্মান সরকার ২০০১ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০,০০০ গ্রীন কার্ড ইস্যু করার কথা ঘোষণা করেছিল। গ্রীন কার্ড থাকলে জার্মানিতে যাওয়ার ভিসা যোগাড় করতে ১০ দিনের বেশি লাগত না। অন্যথায় এরজন্য দু'মাসও লাগতে পারে।

জার্মানির বাজারে কর্মরত তথ্য-প্রযুক্তিবিদ্‌দের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ বছর জানুয়ারি মাসে জার্মান সরকার যে ১৩,৫৬৬টি গ্রীন কার্ড ইস্যু করেছে তার মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা ৩২৬২। সাম্প্রতিক এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলি — যারা প্রচুর পরিমাণ প্রযুক্তিবিদ পাঠাতো, তাদের প্রায় ৭০ শতাংশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

জার্মানি জুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এখন ভাটা চলছে। ফলে জার্মান তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের অনেকেই কাজ হারিয়েছে। জার্মানিতে গ্রীন কার্ড হোল্ডারেরা কাজ হারালেও সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে আরও ৬ মাস সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

ইতিপূর্বে আমরা আমেরিকার ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখেছি। আমেরিকান তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ধস নামার ফলে ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার প্রযুক্তিবিদদের ফিরে আসতে হয়েছে। যারা আসেনি তাদের কম বেতনে কাজ করতে হচ্ছে। বিশ্বায়নের ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে যখন গোটা বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জয়ধ্বনি করা হচ্ছিল, তার ঢেউ আমাদের দেশের বাজারেও আছড়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে গলা মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকারও এখানে শিক্ষিত যুবকদের তথ্যপ্রযুক্তির কাজ পাওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। এমনকি একজন তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে। যদিও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে যত মন্দাই আসুক না কেন, তাতে যত প্রযুক্তিবিদের চাকরি যাক না কেন, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রীর চাকরি নাও যেতে পারে।

আগেই আমরা বলেছিলাম, যে দেশেই হোক না কেন, বুনিয়াদী শিল্পগুলি যদি চাঙ্গা না থাকে, তবে তথ্যপ্রযুক্তি কোন কাজে লাগবে ? শুধুমাত্র যুদ্ধশিল্পকে ভিত্তি করে কখনো এইরকম একটি আধুনিক শিল্প বেশিদিন চলতে পারে না। পুঁজিবাদের আপন নিয়মেই বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বুনিয়াদী শিল্পে মন্দা চলছে। এই মন্দা কাটানোর ক্ষমতা আজ আর পুঁজিপতিশ্রেণীর নেই। কখনো কখনো একটু চাঙ্গা হলেও তা আবার মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। ফলে সর্বত্রই তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের একই দশা। সাথে সাথে জার্মান সরকারের এই সিদ্ধান্ত এও দেখিয়ে দিল বিশ্বায়নের মধুর বাণী, দেশের সীমানা ভেঙে আন্তর্জাতিক নাগরিকত্বের বুকনি, দুনিয়া জুড়ে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির প্রলোভন — সবই আসলে মরীচিকা, পুঁজিবাদী শোষণ ও সংকটকে আড়াল করার মনোহারী মুখোস মাত্র।

কমরেড ব্যোমকেশ বিশ্বাস লাল সেলাম

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট লোকাল কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড ব্যোমকেশ বিশ্বাস গত ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কমরেড ব্যোমকেশ বিশ্বাস বসিরহাট-হাসনাবাদ এলাকার দলের অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগঠক ছিলেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কৃষক ও ক্ষেত মজদুর সমিতির সহ সভাপতি ছিলেন। তিনি ৭০-এর দশকে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন, যখন বসিরহাট মহকুমায় এস ইউ সি আই-র সংগঠন সবেমাত্র গড়ে উঠছে। মহকুমায় প্রশাসন ও বিরোধীদের আক্রমণ থেকে তাঁতিদের রক্ষা করতে তিনি প্রবল ঝুঁকি নেন। নানা সময়ে তাঁর ওপর আক্রমণ সত্ত্বেও তিনি নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের কাজ করে গেছেন। তীব্র রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্ধ সফল করতে তিনি কাজ করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড়।

২ মার্চ শসিনা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্মরণ সভায় অসংখ্য শ্রমিক কৃষক তাঁদের একান্ত আপনজন প্রয়াত কমরেড ব্যোমকেশদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিশির মিস্ত্রী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দেবপ্রসাদ ভঞ্জচৌধুরী।

কেন্দ্রীয় বাজেট

সি পি এম-এর প্রতিক্রিয়া

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় এন ডি এ জোট সরকার ২০০৩-০৪ সালের জন্য যে বাজেট তৈরি করেছে, তার মধ্য দিয়েই পরিষ্কার, আসলে বিজেপি কোন্ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে চায়। এই বাজেটে উল্লসিত শিল্পপতিমহল। এন ডি এ-র শরিক হিসাবে তৃণমূল এই বাজেটের প্রশংসা করেছে। নরম সুরে বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। কারণ বিজেপির এই বাজেট ১৯৯১ সালের কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহের উদারনীতির পরিপূরক বাজেটের গৈরিক সংস্করণমাত্র। কংগ্রেস বা তৃণমূল এটাই করবে তা স্বাভাবিক।

কিন্তু অদ্ভুত হল এই বাজেট সম্পর্কে সি পি আই (এম) নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া। ''কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনবিরোধী আখ্যা দিতে রাজি নন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। এমনকি এটাকে ধনী শিল্পপতিদের বাজেট হিসাবেও চিহ্নিত করতে চাননি তিনি। (আনন্দবাজার ১-৩-০৩)।'' ডঃ অসীম দাশগুপ্ত গণশক্তিতে (১-৩-০৩) 'কেন্দ্রীয় বাজেট সাধারণ মানুষের এবং রাজ্যগুলির সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখলেও কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'জনবিরোধী' বলতে চাইলেন না কেন? কেন তিনি এই বাজেটকে ধনী শিল্পপতিদের বাজেট হিসাবে আখ্যায়িত করলেন না?

সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো দায়সারা গোছের একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছে, বাজেটে সব সুবিধা ধনীদেরই। সি পি আই (এম) নেতা অনিল বিশ্বাস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'বেকারদের কি হবে?' ব্যস, এই পর্যন্তই। গণশক্তির লেখাগুলোতে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম)-এর লড়াইয়ের আহবান। বরং দেখা গেল বাস মালিকরা দাবি তোলার আগেই ডিজেলের দরবৃদ্ধিকে অজুহাত করে পরিবহন মন্ত্রী নিজে ভাড়াবৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছেন। কেন সি পি আই (এম) নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় বাজেটকে শুধু মৌখিক সমালোচনা করেই দায়িত্ব শেষ করলেন, আন্দোলনের উদ্যোগ নিলেন না? কারণ আর কয়েকদিন বাদে তাঁরাই পেশ করবেন রাজ্য বাজেট। এই বাজেটেও সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট যা উপহার দেবে, যার ইঙ্গিত ১০ ফেব্রুয়ারির গণশক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় বাজেটের মতই কোন অংশে কম জনবিরোধী হবে না সেটা তাঁরা জানেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রশ্নে সি পি আই (এম) উদ্যোগী নয়। সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী অবস্থানে থাকার জন্য গদির স্বার্থে যতটুকু অন্তত মৌখিক বিরোধিতা না করলে নয়, ঠিক ততটুকু বিরোধিতা, অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার মধ্যেই সি পি আই (এম) নেতৃত্ব রয়ে গেলেন। সি পি আই (এম) কর্মী-সমর্থকরা নেতৃত্বের এই কংগ্রেস বিজেপি ঘেঁষা আর্থিক নীতি মেনে নেবেন কি?

শিলিগুড়িতে চা-বাগান শ্রমিকদের অনশন অবস্থান

অবিলম্বে বিনাশর্তে সমস্ত বন্ধ চা বাগান খোলা, বাগান খোলার নামে সম্পাদিত শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাচুক্তি বাতিল, নিয়মিত বেতন, রেশন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, পি এফ-এর টাকা আত্মসাৎকারী চা-মালিকদের গ্রেপ্তার, চা বাগানের জমিতে টাউনশিপ না গড়া ইত্যাদি দাবিতে ইউ টি ইউ সি- লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন NBTPEU-এর ডাকে গত ৩ মার্চ থেকে শিলিগুড়িতে JLC অফিসের সামনে ২৪ ঘণ্টার অনশন-অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগিচা থেকে তিন শতাধিক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। ২২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি অনশনে বসেন। এই অনশন অবস্থানে বক্তব্য রাখেন NBTPEU-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক, শঙ্কর গাঙ্গুলী, অভিজিৎ রায়, গোপী ছেত্রী, গোপাল খেশ্ প্রমুখ। সমস্ত বক্তাই সরকারের মালিকতোষণনীতিকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে মালিকদের তৈরি করা সংকটের অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি হ্রাসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। বক্তারা অন্যান্য তথাকথিত বড় ইউনিয়নগুলির আপসকামী ভূমিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জীবনজীবিকার স্বার্থে সঠিক নেতৃত্ব চিনে নেওয়ার জন্য সমস্ত চা শ্রমিকদের কাছে আহবান জানান। অবস্থান মঞ্চ থেকে এক প্রতিনিধি দল জয়েন্ট লেবার কমিশনারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি লেবার কমিশনারের কাছে উপরোক্ত দাবিগুলির ভিত্তিতে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন।

মার্কসবাদের জ্ঞানভান্ডারে স্ট্যালিনের অবদান অমূল্য

একের পাতার পর

করেছিলেন, ৬ বার নির্বাসিত হন, তাঁর মধ্যে পাঁচবার তিনি দুর্গম নির্বাসনস্থল থেকে পালিয়ে আসেন। এর মধ্যেই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

রুশ বিপ্লবের পর ১৪টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ যৌথভাবে ঘিরে অঘোষিত যুদ্ধ করে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত করে, সেই যুদ্ধেও বিভিন্ন ফ্রন্টে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন স্ট্যালিন।

১৯২২ সালে লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটি স্ট্যালিনকে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট সমাজতন্ত্র কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। একে সোভিয়েট ইউনিয়ন তখনও এক মধ্যযুগীয়, খুবই অনুন্নত দেশ। তার উপর গৃহযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, লেনিনবাদবিরোধী চক্রের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ। এর মাঝে প্রয়াত লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘে তিনি সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার যে শপথ নিয়েছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাতে অবিচল ছিলেন। কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, শিক্ষা সমস্ত দিকে বিশাল অগ্রগতি এবং আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েটের নতুন মানুষ গড়ার যে অবিশ্বাস্য কাজ মাত্র ১০ বছরের মধ্যে কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে হয়েছিল — তা না হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে পারত না।

তিনি বলেন — এই সময়ই, ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়েছিলেন, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এই বিরাট কর্মযজ্ঞে তিনি অভিভূত হয়ে বলেছিলেন রাশিয়ায় না এলে আমার তীর্থযাত্রা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকত।

স্ট্যালিন অনুন্নত সোভিয়েট ইউনিয়নকে উন্নত আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। আবার এই পর্যায়েই তিনি লেনিনবাদবিরোধী চক্রের মোকাবিলা করেন। যারা গোপনে হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভেতর থেকে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, সেই ট্রটস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভের চক্রান্ত তিনি ব্যর্থ করেন। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের পর্যায়ে বিরোধী গোষ্ঠীর অধিকার খর্ব করা হয়নি। ঐ সময়ে ট্রটস্কিপন্থীরা সংবাদপত্র প্রকাশ, প্রকাশ্যেই মিটিং, মিছিল, রাজনৈতিক কাজকর্ম করেছে। কিন্তু ১৯৩৪ সালে কিরভ হত্যার পর বিরোধীদের সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের যোগসাজস এবং স্ট্যালিন সহ প্রথম সারির নেতাদের হত্যার চক্রান্ত উদঘাটিত হয়। ১৯৩৬ থেকে ৩৮ পর্যন্ত তিনটি পর্বে প্রকাশ্য বিচারে অভিযুক্তদের পূর্ণ আইনী অধিকার দিয়ে, বিদেশি সাংবাদিক, কূটনীতিবিদ, রাষ্ট্রদূত আইনবিদদের উপস্থিতিতে তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়। এই বিচার নিয়ে সেদিন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা কুৎসা প্রচার করেছে, কিন্তু বিচারের সময় উপস্থিত বিদেশি প্রতিনিধিরাও বিচারকে নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ও আইনানুগ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রমাঁ রঁলা, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র — কমিউনিস্ট না হওয়া সত্ত্বেও মস্কোর ট্রায়াল নিয়ে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ তোলেননি। সোভিয়েটে উপস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস সহ বিশ্বের অনেকেই সেদিন বলেছিলেন মস্কো বিচারের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘরশত্রু পঞ্চম বাহিনীকে খতম করেছিল বলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার রাশিয়ার ভেতরে পঞ্চম বাহিনীর সাহায্য পায়নি। সেদিন ফ্যাসিবাদীরা, পরে ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদীরা মস্কো বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং আজও বুদ্ধিভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এসব প্রশ্ন তোলে। কিন্তু সেদিন এই পদক্ষেপ না নিলে হিটলারকে পরাজিত করে মানবসভ্যতাকে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার বাহিনীকে পরাস্ত করতে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও রুশ জনগণের গভীর শ্রদ্ধাভাজন নেতা হিসাবে স্ট্যালিনের ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি তুলে ধরেন। সমকালীন বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের ও রুশ জেনারেলদের স্মৃতিচারণা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে স্ট্যালিনের চরিত্রের নমনীয়তা, সংবেদনশীলতা ও জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসার দিকগুলি তুলে ধরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন দল, বিপ্লব, সমাজতন্ত্র এবং স্ট্যালিন এক ও অভিন্ন ছিল। ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী চক্র সি পি এস ইউ-এর বিংশতি কংগ্রেসে ব্যক্তিপূজাবাদের বিরোধিতার নামে যখন স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা প্রচার শুরু করে তখন কমরেড শিবদাস ঘোষই সর্বপ্রথম দেখান স্ট্যালিনের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা আসলে লেনিন এবং লেনিনবাদকেই আঘাত করা এবং এর পরিণতিতে সমাজতন্ত্র ও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষতি করা। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দেখিয়েছেন — লেনিনবাদ যে আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে যথার্থ মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদ বলতে কী বোঝায় — এগুলি কমরেড স্ট্যালিনের কাছে সকলেই শিখেছে।

কমরেড স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে কলকাতার রানি রাসমণি রোডের সভার একাংশ

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, মার্কসবাদের তত্ত্বগত জ্ঞানভাণ্ডারেও কমরেড স্ট্যালিনের মৌলিক অবদান রয়েছে। 'লেনিনবাদের সমস্যা' এবং 'লেনিনবাদের ভিত্তি' এই দুটি বইয়ে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও বুখারিনদের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে তিনি লেনিনবাদকে তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেনিন যে কেবল রাশিয়ার বিপ্লবের নয়, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা, তাও স্ট্যালিনই প্রথম দেখান।

এই কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও ১৯৩৬ সালে জনগণের মতামত নিয়ে কীভাবে নতুন সংবিধান রচিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে কমরেড প্রভাস ঘোষ দেখান — ৮ কোটি খসড়া সংবিধান জনগণের মধ্যে বিতরণ করে লক্ষ লক্ষ সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা বিচার করে তবে রচিত হয়েছিল নতুন সংবিধান। এই সংবিধানেই নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে আনার অধিকার জনগণকে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি বলেন, জাতি সমস্যার মতো জটিল ও শত শত বছরের পুরনো সমস্যা, ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগ, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের বইগুলি মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজন। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের দর্শনগত বক্তব্যগুলিকে ভিত্তি করে তিনিই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ শীর্ষক ঐতিহাসিক পুস্তক রচনা করেছিলেন, যেটা সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গাইড করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের রূপকার, হিটলারি ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মানবসভ্যতার রক্ষাকর্তা, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক ও শক্তিশালী বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা হিসাবে গোটা বিশ্বের শ্রদ্ধাভাজন কমরেড স্ট্যালিন ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। 'লেনিনের ছাত্র' — এই পরিচয়কেই তিনি সবচেয়ে বড় মনে করতেন। একবার

আটের পাতায় দেখুন

মস্কোর রেড স্কোয়ারে স্ট্যালিনের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে চলেছে রাশিয়ার মানুষ

রাশিয়ায় স্ট্যালিনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে

অধিকাংশ রুশ নাগরিক মনে করেন যে, খারাপ কাজের চাইতে স্ট্যালিনের করা ভালো কাজের পরিমাণ অনেক বেশি। তাঁর ৫০তম প্রয়াণ বার্ষিকীর প্রাক্কালে রাশিয়ার 'পাবলিক ওপিনিয়ন ফাউণ্ডেশন'-এর নেওয়া এক জনমত সমীক্ষায় ৩৬ শতাংশ রুশ নাগরিক এই মত ব্যক্ত করেছেন। এই মতের বিরোধিতা করেছে মাত্র ২৯ শতাংশ। অপর একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, স্ট্যালিনের নাম উচ্চারিত হলে কোন্ ধারণাটি সর্বাগ্রে তাদের মনে আসে। এর উত্তরে ৩২ শতাংশ মানুষ জানিয়েছে, তাঁর ইতিবাচক ভাবমূর্তি, যথা, সমাজশৃঙ্খলা, জিনিসপত্রের কম দাম এবং শিল্পায়ন। (সংবাদসূত্র ঃ *দি স্টেটসম্যান*, ১লা মার্চ, ২০০৩)

.....আজও বহু রুশ নাগরিক পেছনের দিকে তাকিয়ে স্ট্যালিনের আমলের স্বর্ণযুগকে স্মরণ করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, স্ট্যালিনের বিবিধ মহৎ কার্যকলাপই তাদের দেশকে মহান করে গড়ে তুলেছে। পুরানো দিনের অনেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন যে, রাশিয়ার বাল্টিক সাগরের উপকূল থেকে আর্কটিক উপকূল পর্যন্ত সংযোগকারী খালটির খননকার্য মাত্র ২০ মাসে শেষ করা হয়েছিল — এ কাজটি যেন তাঁর অনেক কীর্তির স্মৃতিসৌধ হয়ে আজও বিরাজমান।

ভিক্টর আনপিলভ বলেন, বিদেশিরা অতীতের মতো আজও যেসব বিষয়ে রাশিয়া সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন সেগুলি হল — মহাকাশে মানুষ প্রেরণের ক্ষেত্রে এই দেশই প্রথম। এই দেশটিতেই ডাক্তাররা প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি করেছে। গণিতবিদ ও পদার্থবিদদের আন্তর্জাতিক লীগের পুরোধা ছিল এই দেশ। এ সব অর্জন করার পিছনে ছিলেন স্ট্যালিন। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, আজ বিদেশিরা রাশিয়ার খনিজ সম্পদ নিয়েই আগ্রহান্বিত। আমাদের (রাশিয়ার) পতনের জন্য ওরা আজ হাসে এবং কটাক্ষ করে।

(সংবাদসূত্র ঃ *দি ইকনমিস্ট* (লণ্ডন) ১লা মার্চ ২০০৩)

নির্জোট আন্দোলন

তিনের পাতার পর

বহু দেশ সেই সত্য নির্মমভাবে উপলব্ধি করছে। কিন্তু একই সাথে ইতিহাসে এ স্বাক্ষরও আছে যে শান্তিকামী শোষিত জনগণের দুর্বার জঙ্গি আন্দোলন অতি বড় যুদ্ধবাজকেও থমকে দেয়। আবার এই শান্তি আন্দোলনই সঠিক নেতৃত্ব খুঁজে নিতে পারলে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের পথ খুঁজে নেয়। যেমন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থনে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন দেশে দেশে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তথা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা আজকের নির্জোট আন্দোলনের দেশগুলির পুঁজিবাদী শাসকদেরও জানা থাকার কথা — অন্তত মহাথির মহম্মদ তাদের সেকথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। কারণ মহাথির মহম্মদেরা এ সত্যও জানেন যে নিজেদের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে দহরম মহরম গড়ে তোলে, সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে বিশ্ববাজারের লোভনীয় হাতছানিতে ভোলে, তার পুরো আঘাতটা পড়ে কিন্তু জনগণের ঘাড়ে। বিপুল ঋণের বোঝা, শুধু শিল্প-কৃষি নয়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ-পরিবহনের মত পরিষেবা সমস্ত ক্ষেত্রে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, তীব্র বেকার সমস্যা — এসব কিছুর আক্রমণে জনগণের জীবন ইতিমধ্যেই দুর্বিষহ। তাই নরমে হোক্, গরমে হোক্, একটু সাম্রাজ্য-বাদবিরোধিতা দেখাতে পারলে তা জনগণকে বিভ্রান্ত করে তাদের কাছে এক দরদী ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারে, তাদের শাসন তথা পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

অবশ্য বিশেষ করে মহাথির মহম্মদের একটা ভিন্ন ভূমিকাও রয়েছে। একসময় নির্জোট আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ভারত, যুগোশ্লাভিয়া আর মিশর। যুগোশ্লাভিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত করে, জাতিদ্বন্দ্বে জর্জরিত করে ও শেষমেশ বোমা মেরে প্রায় শুইয়ে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দিক থেকে মিশর আজ আর আরব দুনিয়ায়ও তেমন কোন প্রভাব ফেলে না। আর ভারতের শাসকরা আজ সাম্রাজ্যবাদ চূড়ামণি মার্কিন শাসকদের প্রায় চোখের মণি। তাই নির্জোট আন্দোলনের নেতার পদ দখলের এখন সুযোগ উপস্থিত। মহাথির মহম্মদ সেই ভূমিকা নিতে চাইছেন; চাইছেন মালয়েশিয়াকে তুলে ধরতে। তাই তিনি সরাসরি ডাক দিয়েছেন যে নিজেদের তেলসম্পদকে ব্যবহার করে চাপ সৃষ্টি করতে হবে — সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য। দেখাতে চাইছেন তিনি কত বড় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী।

অবশ্য এই বিষয়ে ভারত কিছু পিছিয়ে নেই। স্বাধীন ভারত বরাবরই নির্জোট আন্দোলনের শরিক। এবারেও সে কুয়ালালামপুর বৈঠকে যোগ দিয়েছে। বস্তুত আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নির্জোট আন্দোলনের সামনে যে সুযোগ এনে দিয়েছে, ভারতীয় পুঁজিবাদ তাকে ছাড়তে চায়নি। একদিন এদেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী নির্জোট আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরের কাছ থেকে সুযোগসুবিধা আদায় করেছে। আজ সেই ভারতীয় পুঁজিবাদ একদিকে সংহত, অপরদিকে আভ্যন্তরীণ বাজারসঙ্কটে জর্জরিত। তাই তার নির্জোট দেশগুলিকে বেশি করে প্রয়োজন, তাদের বাজার তার কাছে লোভনীয়। নির্জোট আন্দোলনের নেতা হতে পারলে তার উভয়ত লাভ — এক, সব না হোক, বেশ কিছু নির্জোট দেশের বাজারে ঢোকার সহজ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। আর দুই, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তুলে ধরতে পারবে যে সে এই সমস্ত দেশের বা নিদেনপক্ষে এই অঞ্চলের মাতব্বর হয়ে উঠতে পেরেছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তার দর, তার গুরুত্ব বাড়াতে পারবে। মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় পুঁজিবাদ আজ আর নিতান্ত নাবালক নেই। উন্নয়নশীল এমনকি উন্নত দেশগুলির বাজারে পুঁজি রপ্তানি করার মাধ্যমে সে নিজে আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অংশীদার হিসাবে অনেকটা পরিণত। বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় তার যেমন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাহায্য প্রয়োজন, তেমনি তাদের সাথে তার দ্বন্দ্বও ক্রমশ বাড়ছে। আজকের পরিস্থিতিতে ভারতীয় পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক লেনদেন, বোঝাপড়া প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধের মার্কিন হুমকির মুখে নির্জোট আন্দোলনের বর্তমান সম্মেলনের যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব — তার কাছে এক বাড়তি সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই প্রস্তাব যাতে উগ্র মার্কিন বিরোধী হয়ে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভারত তাতে সায় দিয়েছে। অন্যদিকে, নির্জোট আন্দোলনকে 'রাজনীতির আখড়া' থেকে বার করে এনে বাণিজ্য-ঐক্য গড়ে তোলার, জোট বেঁধে ডব্লু টি ও-তে দরকষাকষি করার আহবান জানিয়েছেন — স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এ যে শুধু কথার কথা নয়, তা প্রমাণ করতে যেন ভারত উঠে পড়ে লেগেছিল। এবারই প্রথম নির্জোট আন্দোলনে বিজনেস ফোরাম হয়েছে; তাতে যোগ দিতে এদেশের পুঁজিপতিদের দুই প্রধান সংস্থা, ফিকি ও সি আই আই — তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। ফোরামের ৭৪ জন বক্তার মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল ভারতের প্রতিনিধি। স্বয়ং বাজপেয়ী তার বক্তৃতায় আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলির পিছিয়ে পড়া অবস্থার কথা তুলে সে দেশের জন্য বিনিয়োগ, ঋণ, সাহায্য ইত্যাদির সুপারিশ করেছেন। এমনকি এবারের বাজেটে পর্যন্ত এই কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে, যা আগে কোনদিন হয়নি। অর্থাৎ নির্জোট আন্দোলনকে আজ ভারতীয় পুঁজিবাদ ভালভাবে কাজে লাগাতে চাইছে, একদিকে আরও বেশি লাভ করে সেসব দেশের বাজারে অনুপ্রবেশের জন্য, তার নিজের প্রভাব বলয় বাড়াবার জন্য; অন্যদিকে আমেরিকা সহ উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে অধিকতর সুবিধা আদায়ের জন্য।

ফলে, অতীতের মতো বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার ক্ষমতা না থাকলেও, আজকের বিশ্বরাজনীতিতে বর্তমান নির্জোট বৈঠক কতকগুলি নিশ্চিত দিক তুলে ধরছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদী শিবির যে স্থায়িত্ব আর প্রগতির স্বপ্ন দেখিয়েছিল, গভীর সঙ্কটে পড়ে বাজার দখলের জন্য তাদের আভ্যন্তরীণ তীব্র দ্বন্দ্বে সে স্বপ্ন আজ খান্ খান্। আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল নির্জোট দেশগুলির কাছে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদের এই দ্বন্দ্ব এনে দিয়েছে তাদের নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থে দরকষাকষি, সুবিধা আদায়ের নতুন সুযোগ। অপরদিকে, বিশেষ করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উগ্র আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত যেভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে, যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ যেভাবে ক্রমশ পুঁজিবাদবিরোধী বিক্ষোভে পরিণত হতে চলেছে, তাতে শঙ্কিত নির্জোট আন্দোলনের শরিক পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণী এই মঞ্চ থেকে যুদ্ধবিরোধী ভাবমূর্তি গড়ে তুলে নিজেদের দেশের জনগণের কাছে 'প্রগতিশীল', 'শান্তিকামী' সাজতে চাইছে। নির্জোট আন্দোলন তাই 'মৃত' নয়। নিছক নির্জোট 'শোরগোল'ও নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ করতে সরকার চক্রান্ত করছে

৪ মার্চ কলকাতা প্রেস ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদের সভাপতি ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল এবং সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন — "১৯৯২ সাল থেকে ১২ বছর ধরে অনুষ্ঠিত ৪র্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা ক্রমাগত জনপ্রিয় হওয়ায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিক্ষক-অভিভাবকদের কাছে এই পরীক্ষা শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে বিবেচিত।" রাজ্য সরকার এই পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য অতীতে নানা চক্রান্ত করেও পরীক্ষার প্রতি বিপুল জনসমর্থনের চাপে তা করতে পারেনি। এখন আবার অভিযোগ করা হচ্ছে — এই পরীক্ষা নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে, এই পরীক্ষা বেআইনী, অবৈধ ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন — "৭৭ সাল পর্যন্ত যখন সরকারিভাবে এই পরীক্ষা প্রচলিত ছিল, তখন সরকার ছাত্রপিছু খরচ করত ২১ টাকা। আর ২৫ বছর বাদে মাত্র ১২ টাকা পরীক্ষা ফি নিয়ে, শিক্ষক, ছাত্র-যুব এবং অভিভাবকদের স্বেচ্ছাশ্রম ও সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে এই পরীক্ষার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে যা অতুলনীয় এবং অভূতপূর্ব। সরকার পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নাম নথিভুক্ত করার জন্যই লাগে ২০ টাকা আর পরীক্ষার ফি কি বিপুল বাড়ানো হয়েছে তা সবাই জানেন।"

শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বক্তারা বলেন — "একসময় ভারতের মধ্যে শিক্ষায় প্রথম পশ্চিমবাংলার শিক্ষার মান আজ নামতে নামতে অষ্টাদশ স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। ধসে যাওয়া শিক্ষার মানকে কিছুটা হলেও এই পরীক্ষা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক এই পরীক্ষা কখনও বেআইনী, অবৈধ হতে পারেনা। এ রাজ্যে মেধা অন্বেষণ, সায়েন্স ট্যালেন্ট টেস্ট, অংকের মেধা পরীক্ষা ইত্যাদি অসংখ্য বেসরকারি পরীক্ষা চলছে। তাঁরা প্রচুর পরিমাণ ফি-ও নেন। তাহলে উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তিপরীক্ষার বিরুদ্ধে শুরু থেকে সরকারি বিরুদ্ধাচরণ এবং তারজন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলার তাৎপর্য যে শুভ নয়, তা সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আমরা আবার দাবি করছি সরকার নিজেই বৃত্তি পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্তন করুন, পাশ-ফেল প্রথা চালু করুন।"

বক্তারা আরো বলেন — "একদিকে সরকার বলছে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের কথা। তারাই আবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে বহির্মূল্যায়নের নামে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে, যে পরীক্ষাটির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।" বক্তারা বলেন, ছাত্র স্বার্থে যতদিন প্রয়োজন হবে এ পরীক্ষা চালানো হবে। একে আরো প্রসারিত করার জন্য সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে তাঁরা আবেদন জানান।

বিহারের বৈশালীতে বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের অপরিমিত মূল্যবৃদ্ধি রদ করা, ২৪ ঘণ্টা নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া, সমস্ত গ্রাহকদের মিটার অনুযায়ী বিল পাঠানো, বিদ্যুৎ দপ্তরের ব্যাপক দুর্নীতি বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে বিহারের বৈশালী জেলায় এস ইউ সি আই মহুয়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি 'বিজলী এস ডি ও'-র দপ্তরের সামনে ধরণা অনুষ্ঠিত হয়।

মহুয়া আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত লিফলেটে বলা হয়েছে স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির ফলে বহু গ্রাম আজও হারিকেনের যুগেই পড়ে আছে। লিফলেটে মহুয়া, রামরায়, বিসকুরবা, শ্রবণপট্টি, মঙ্গুরাহাঁ, পাহাড়পুর পশ্চিম টোলা সহ সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবি করা হয়েছে।

ধরণায় অংশগ্রহণরত সমবেত আন্দোলনকারীদের সামনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ ইন্দ্রদেব রায়, ললিতকুমার ঘোষ, বিশ্বনাথ সাহু, রামনাথ রায়, নন্দলাল রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই বৈশালী জেলা কমিটির সদস্য এবং মহুয়া লোকাল কমিটির সেক্রেটারি কমরেড রামজীবন সিংহ।

বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

পুরুলিয়ায় আইনঅমান্য

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ভুতুড়ে বিল, লো-ভোল্টেজ, লোডশেডিং, গ্রাহকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়, বেআইনি লাইন কাটা, বিদ্যুৎ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, চুরি, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রতিবাদে ২৫ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া জেলা শাসকের দপ্তরে জেলার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা আইন অমান্য করেন।

জুবিলি ময়দান থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল পুরুলিয়া শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরের নিকট পৌঁছায়। বিরাট পুলিশ বাহিনী মিছিলের গতিরোধ করলে পুলিশ কর্ডন ভেঙে আইন অমান্য করা হয়। আইন অমান্যে নেতৃত্ব দেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক নন্দলাল চৌবে, শৈলেন বাউরী, লক্ষ্মীনারায়ণ সিন্‌হা এবং কমিটির সম্পাদক রঙ্গলাল কুমার।

কোচবিহারে লাঠিচার্জ

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবসে কোচ-বিহার ও আলিপুরদুয়ারে একদিনের বিল বয়কটের কর্মসূচি পালিত হয়।

আলিপুরদুয়ার বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস গেটের বাইরে এ্যাসোসিয়েশনের স্বেচ্ছাসেবকরা যখন শান্তিপূর্ণভাবে গ্রাহকদের কাছে বিল বয়কটের আবেদন জানাচ্ছিলেন, তখন পুলিশ এসে কোন প্ররোচনা ও সতর্কীকরণ ছাড়াই তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে। এ্যাসোসিয়েশনের আলিপুরদুয়ার মহকুমা কমিটির সহ-সম্পাদক অভিজিৎ রায় গুরুতর আহত হন। তাঁকে এবং আরও তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

উপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে কোচবিহার ও তুফানগঞ্জে বিল বয়কটের কর্মসূচি সফলভাবে প্রতিপালিত হয়। দিনহাটা ও মাথা-ভাঙ্গাতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সমাবেশগুলিতে বক্তব্য রাখেন সমীর গুহমজুমদার, সত্যেন ঘোষ, ভাস্কর সরকার, অবনী রায়, আবদুর রউফ আমেদ, গৌতম চন্দ প্রমুখ।

বাঁকুড়ায় অবস্থান

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশন-এর বাঁকুড়া জেলা কমিটির ডাকে বাঁকুড়া মাচানতলায় বিক্ষোভ অবস্থান হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক এতে অংশ নেন। জেলার সহ-সভাপতি প্রবীণ শিক্ষক কমলাকান্ত কর্মকারের পৌরোহিত্যে সভার কাজ শুরু হয়। গ্রুপ সাপ্লাই ভিত্তিক গ্রাহক কমিটির নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন। বক্তারা স্তরে স্তরে পর্ষদ কর্তৃপক্ষের তুঘলকি কাণ্ড, দায়িত্বহীন আচরণের দিকগুলি ক্ষোভের সাথে তুলে ধরেন। সকলেই গ্রাহক কমিটি গড়ে তুলে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন। জেলার সহ-সম্পাদক জয়দেব কর তার দীর্ঘ ও আবেগপূর্ণ ভাষণে কেন্দ্র ও রাজ্যের জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন। জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ তাঁর বক্তব্যে বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধির চক্রান্তরোধে গ্রাহক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মেদিনীপুরে অফিস গেটে তালা

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যেই অবস্থান, বিক্ষোভ, আইন অমান্য ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়। মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম), বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই চার জেলার বিদ্যুৎ পর্ষদের অধিকর্তা, মেদিনীপুর জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরে ছিল সারাদিনব্যাপী অবস্থান এবং ডেপুটেশন। বেলা ২টায় ডেপুটেশনের সময় নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও বিকাল ৪টা পর্যন্ত জোনাল ম্যানেজার না আসায় শত শত গ্রাহক প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ম্যানেজারের দপ্তরের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে দাবি তোলেন দপ্তরের কোন কর্মচারীকেই বাইরে যেতে দেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জোনাল ম্যানেজার না আসেন। বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে গেট খুলে দেয় কিন্তু বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ক্ষোভ এবং জোনাল ম্যানেজারের দুর্ব্যবহারের সংবাদ ইতিমধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ায় বহু সাধারণ মানুষ এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। সন্ধ্যা ৭টায় ম্যানেজার এসে সকলের সামনে মার্জনা চাইলে রেহাই পান। তাঁর অনুরোধে পরবর্তী আলোচনার দিন ২১ মার্চ স্থির হয়েছে।

কাজের দাবিতে কনভেনশন

বেকারী, কর্মী ও কর্মসঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে এবং সমস্ত বেকারের কাজের দাবিতে ইউ টি ইউ সি-এল এসের আহবানে পুরুলিয়া শহরের হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবদের অংশগ্রহণে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন ইউ টি ইউ সি-এল এস পুরুলিয়া জেলা সহ-সম্পাদক কমরেড শশাঙ্ক মাজী।

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মূল প্রস্তাবে বলা হয় — হাজার হাজার কারখানা লকআউট বা বন্ধ হওয়ার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক প্রতিদিন কর্মচ্যুত হচ্ছে। ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, বিদ্যুৎ, কয়লা, ডাক-তার প্রভৃতি বেসরকারিকরণ করে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিচ্ছে সরকার। এই জনবিরোধী ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক সহ সমস্ত স্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এসের সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী, সারা ভারত কে কে এম এস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শেখ খোদা বক্স, ইউ টি ইউ সি-এল এসের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড ডি কে মুখার্জী।

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অফিসে বিক্ষোভ

মাশুল নির্ধারণে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গত ৩ মার্চ বিধাননগর পৌরভবনে অবস্থিত কমিশনের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন সকলের জন্য অভিন্ন বিদ্যুৎ মাশুল ঘোষণা করে গৃহস্থ, গরিব মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি গ্রাহকদের জীবনে গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। বিক্ষোভকারীরা কমিশনের কাছে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন ১৯৯৮-এর ২৯(২) ও ২৯(৩) ধারার যথোচিত গুরুত্ব ও সঠিক প্রয়োগের দাবি জানান।

বিক্ষোভকারীদের সামনে বক্তব্য রাখেন এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস। তিনি বলেন, কমিশনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বছর বছর বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা, যদিও তার দায়িত্ব ছিল মূল্যনিয়ন্ত্রণ করা। যদি কমিশন অযৌক্তিকভাবে শুধু বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির যন্ত্রে পরিণত হয়, তবে তাঁরা কমিশনের কার্যধারার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন। প্রয়োজনে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অফিস ঘেরাও করা হবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অনুকূল ভদ্র, প্রদীপ বসু, মণিমোহন ঘোষ প্রমুখ।

পুনর্বাসনের দাবিতে রায়দীঘি হকার্স সম্মেলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দীঘি হকার্স ইউনিয়নের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক হকার এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন ইউনিয়নের সভাপতি সনাতন দাস। রায়দীঘি বাজার সংলগ্ন পি ডবলু ডি-র জায়গায় গাড়ি পার্কিং, যানচলাচল ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জায়গা ছাড় দিয়েও অবশিষ্ট যে জায়গা থাকবে তাতে হকার্স কর্ণার করে এই হকাদের পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি জানান হয়।

ইতিপূর্বে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ডায়মণ্ডহারবারের এস ডি ও-র কাছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিয়ে এই হকার্স কর্ণার নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে। এর জন্য পি ডবলু ডি ইঞ্জিনিয়ার (আলিপুর ডিভিশন নং-২) জায়গা দিতে রাজি আছেন। রায়দীঘি গ্রামপঞ্চায়েতের সুপারিশক্রমে মথুরাপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি হকার্স কর্ণার করার স্কীম, প্ল্যান এস্টিমেট করে জেলা পরিষদে পাঠিয়েছে। স্থানীয় এম এল এ, রায়দীঘি ব্যবসায়ী সমিতি, স্থানীয় জেলাপরিষদ সদস্যও এই হকার্স কর্ণার গড়ার সুপারিশ করেছেন।

ডেপুটেশনে আবেদন করা হয়, উক্ত স্থানে দীর্ঘমেয়াদী লীজ দিয়ে হকার্স কর্ণার গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হোক। আবেদন মঞ্জুর না হলে হকার্স ইউনিয়ন আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলেও এস ডি ও-কে জানানো হয়েছে।

৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতায় নারী নির্যাতন ও যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৩০ সংখ্যা ৮

আগামীদিনের বিপ্লব হবে জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ

পাঁচের পাতার পর

একজন কমরেড নিজেকে লেনিন ও স্ট্যালিনের ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন। উত্তরে স্ট্যালিন বলেন — আমি 'লেনিনের ছাত্র', স্ট্যালিনের কেউ ছাত্র হতে পারে না, ছাত্রের আবার ছাত্র হয় কীভাবে। জার্মান সাংবাদিক এমিল লুদ্‌ভিগকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন — "আমি লেনিনের ছাত্র। আমার গোটা জীবনের সাধনা হল, যেন আমি তাঁর যোগ্য ছাত্র হতে পারি।"

তিনি বলেন — সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের সুযোগে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে অবাধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। ইরাকের ওপর যুদ্ধের ছায়া। স্ট্যালিন সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে যুদ্ধবিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলনের ঘাঁটিতে পরিণত করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বশক্তি আজ থাকলে সাম্রাজ্যবাদ এমন বেপরোয়াভাবে দেশে দেশে যুদ্ধ ও গণহত্যা চালাতে পারত না।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কেন সমাজতান্ত্রিক শিবির ভাঙল — এরও উত্তর দিয়েছে মার্কসবাদ লেনিনবাদ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর লেনিন বলেছিলেন, পরাজিত বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। স্ট্যালিন বলেছিলেন — সমাজতন্ত্র যত এগোবে শ্রেণীসংগ্রাম তত তীব্র হবে। অতীতেও ইতিহাসের বড় বড় সংগ্রাম বহু বছর ধরে চলেছে। নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০/১৫০ বছর লড়তে হয়েছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কয়েক শত বছর লড়তে হয়েছে। এগুলি শোষণ থেকে চিরতরে মুক্তির লড়াইও নয়, এক ধরনের শোষণের বদলে অন্য ধরনের শোষণ প্রচলনের লড়াই। সমাজতন্ত্রের লড়াই হল ইতিহাসে সর্বপ্রথম শোষণকে চিরতরে খতম করার লড়াই। সেই অর্থে এ লড়াই হাজার হাজার বছরের শোষণ, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই। অতীতের সকল বিপ্লবী লড়াইয়ের তুলনায় এ লড়াই অনেক কঠিন।

তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র এলেও, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সাম্যবাদে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী পর্যায়। তাই এখানে পুঁজিবাদী উপাদান থাকে। রাশিয়াতেও তা ছিল। মুদ্রার প্রচলন, বাড়ির মালিকানা, মজুরির পার্থক্য, কালেকটিভ ফার্মে উৎপাদিত কৃষিপণ্যে মালিকানা তখনও ছিল। দলের মধ্যে পিছিয়ে-পড়া চিন্তায় পুঁজিবাদের অবশেষ ছিল, পার্টির বাইরে বিরাট জনগণের ভাবজগতে পুঁজিবাদী চিন্তা যথেষ্ট ছিল। তার উপর পরাজিত বুর্জোয়ারা, জমিদার, নেপম্যানেরা ছিল, যারা ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। সমাজতন্ত্র থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়ার মানসিকতা ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, বিপ্লব কিছুটা স্থিতিলাভ করার পর, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কিছুটা সংহত ও উন্নত হওয়ার পর বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ রূপে শক্তিশালী হয়ে বিপদ সৃষ্টি করে, সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করে। এখানে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়ে ব্যক্তিকে ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত করে সমাজ ও বিপ্লবের সাথে একাত্ম করানো। দলের ১৯তম কংগ্রেসে স্ট্যালিন হুঁসিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন — ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক মানসিকতা ও সংস্কৃতি আজও রয়েছে। লেনিনবাদবিরোধী শক্তি পুরোপুরি শেষ হয়নি। ১৯তম কংগ্রেসে কমরেড স্ট্যালিন আরও বলেছেন দলের আদর্শগত মান নেমে গিয়েছে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দুর্বল হওয়ার অর্থ হল বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি। তিনি বলেছিলেন, মস্কোর মতো জায়গায় তত্ত্বচর্চা অবহেলিত হচ্ছে। কিছু নেতা সমালোচনা সহ্য করেন না, শুধু প্রশংসা চান। তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে যেভাবে কাজ করতে হয়েছে তাতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ক্ষতি হয়েছে। স্ট্যালিনের সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা বলেছেন — স্ট্যালিন কখনো একা সিদ্ধান্ত নিতেন না। সকলের মতামত নিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অন্যান্য স্তরে এভাবে কাজ হয়নি, দলে ব্যক্তিবাদ এসেছে।

৫ মার্চ ২০০৩ লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতি নিয়ে মস্কোয় মিছিল

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — আদর্শগত মানের অবনমনের সঙ্গে স্ট্যালিনের মতো বিরাট মাপের নেতার উপস্থিতি দলের মধ্যে এবং বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে যে অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করেছিল — এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নেতৃত্বের এবং দলের এই আদর্শগত মানের অবনমনের ফলে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বে আসেন এবং মার্কসবাদের বদলে শোধনবাদের চর্চা শুরু করেন। কিন্তু দল ও নেতৃত্বের প্রতি অন্ধতা থাকার ফলে কর্মীরা ও শ্রমিকশ্রেণী এর বিপদ বুঝতে পারে নি। সেই ধারা বেয়েই গরবাচেভ প্রতিবিপ্লবী চক্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র ধ্বংস করে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে এনেছে। স্ট্যালিনের সময় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন মানবতার পীঠস্থান, মানবমুক্তির দিশারী এবং বিশ্বশান্তির রক্ষক হিসাবে বিরাট সম্মানের অধিকারী ছিল, পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনার পর সেই দেশ ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। নারীকে সমমর্যাদা দেওয়ার পথে যে দেশ বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল সেই দেশের নারীরা আজ পয়সার জন্য দেহবিক্রিতে বাধ্য হচ্ছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রাথমিক আঘাত কাটিয়ে দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী, পুঁজিবাদ-বিরোধী গণআন্দোলন মাথা তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলে, ইউরোপ আমেরিকার বুকে শ্লোগান উঠছে, "পুঁজিবাদ নিপাত যাক।" এ লড়াই এখানেই থামবে না, আওয়াজ উঠবে "সমাজতন্ত্র চাই।"

তিনি বলেন, প্যারি কমিউনে শ্রমিকশ্রেণী প্রথম ক্ষমতা দখল করেছিল কিন্তু রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করেনি। প্যারি কমিউন টিকে থাকতে পারেনি। এ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন মার্কস-এঙ্গেলস। বলেছেন, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুরানো রাষ্ট্রকে ভাঙতে হবে। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় দেখিয়ে দিল অর্থনীতি রাজনীতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মানের অগ্রগতি না ঘটাতে পারলে, বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে না পারলে প্রতিবিপ্লব তার সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে শ্রমিকশ্রেণী যে বিপ্লব ঘটাবে, তা জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় হবে আরও সমৃদ্ধ, আরও অপরাজেয়।

এই কথা বলে, কমরেড স্ট্যালিনের প্রতি বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

সভার সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের কয়েকটি শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'ছোট ছোট কাজের মধ্যে চরিত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিফলন থাকে। তাই কাজ যত ক্ষুদ্রই হোক কমিউনিস্টরা অবহেলার সঙ্গে তা করে না — এটি স্ট্যালিনের শিক্ষা। তিনি বলেন — পার্টি সদস্যপদের মর্যাদা রক্ষা করা, পার্টির ঐক্য আরও সুদৃঢ় করা এবং আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে আত্মস্থ করার শিক্ষাও স্ট্যালিন দিয়েছেন। কমরেড স্ট্যালিনকে স্মরণ করে আগামী দিনে দলের নেতৃত্বে গণআন্দোলনকে আরও তীব্র করার আহবান তিনি জানান।

সভার শুরুতে কমরেড স্ট্যালিনের উপর রচিত সংগীত পরিবেশন করে দলের সংগীত স্কোয়াড। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

কমরেড স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পাটনায় মিছিল ও জনসভা

৫ মার্চ ২০০৩, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের মহান নেতা স্ট্যালিনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটির ডাকে পাটনা শহরে স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে সুসজ্জিত মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল সুভাষচন্দ্রের মূর্তির পাদদেশ থেকে বেরিয়ে ফ্রেজার রোড, ডাকবাংলো চৌরাস্তা, স্টেশন রোড হয়ে আই এম এ হলে পৌঁছায়। যুদ্ধবিরোধী শ্লোগানে মুখরিত মিছিলে আওয়াজ ওঠে — "সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিস্ট যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমরেড স্ট্যালিন তোমায় ভুলিনি — ভুলব না।"

সভায় প্রধান বক্তা, দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড রনজিৎ ধর বলেন — আজ যখন গোটা দুনিয়ার সামনে যুদ্ধের গুরুতর বিপদ; সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজস্ব স্বার্থে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করতে চাইছে, সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে কমরেড স্ট্যালিনকে স্মরণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। কমরেড রনজিৎ ধর বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট হিটলার বাহিনী যখন মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল তখন কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের পরাস্ত করে। স্ট্যালিন ছিলেন বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির কাছে প্রেরণার উৎস। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ বহু দিক থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। বেকারি, ভিক্ষাবৃত্তি, দেহব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক ও সর্বজনীন। স্ট্যালিন বিরোধী প্রচলিত কুৎসা খণ্ডন করে তিনি দেখান স্ট্যালিনের কাছে মানবমুক্তি, সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের প্রয়োজনের চেয়ে বড় কিছু ছিল না। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদীরা দলের নেতৃত্ব কবজা করে এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন ঘটায়।

এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিবশঙ্কর মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net